গুরুত্ব পূর্ন কিছু ইসলামী পরিভাষা

ইসলামঃ ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পন। আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পন করার নাম ইসলাম।

ইসলাম গ্রহনঃ ইসলামের মৌলিক বিষয় সমূহ মেনে নিয়ে ইসলাম গ্রহন করতে হয়। ইসলামের মৌলিক বিষয় ৫টি। শাহাদাহ, সালাত, যাকাত, সাওম ও হাজ্জ।

ঈমানঃ ঈমান অর্থ বিশ্বাস। ইসলামের যাবতীয় বিষয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখা, মুখে স্বীকৃতি দেয়া এবং এ অনিযায়ী জীবন যাপনকে ঈমান বলে। ইসলামের মূল বিষয় ঈমান।

আক্বীদাহঃ আক্বীদাহ অর্থ অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস। ইসলামের যাবতীয় বিষয়ে সন্দেহ ও সংশয় মুক্ত হয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখাকে আক্বীদাহ বলে। আক্বীদাহ ঈমানের মূল।

আক্বীদাহ মানুষের পরিচিতি বহন করে। আক্বীদাহ সঠিক না হলে ঈমান ঠিন হয় না। আর ঈমান ঠিক না হলে ইসলাম মূল্যহীন হয়ে যায়।

দ্বীনঃ দ্বীন অর্থ জীবন বিধান। সৃষ্টির কল্যানে আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধানকে দ্বীন বলে। আল্লাহর মনোনীত দ্বীনের নাম ইসলাম।

শারীয়া'হঃ শারীয়া'হ অর্থ আইন, বিধান, নীতিমালা ইত্যাদি। সৃষ্টির কল্যানে মহান আল্লাহ যে নীতিমালা ঠিক করে দিয়েছেন ইহাকে শারীয়া'হ বলে। শারীয়া'হর মূল উৎস: কুরআন ও সুন্নাহ।

ফিকহঃ ইসলামী আইন শাস্ত্রকে ফিক্বহ বলে। শারীয়াহর বিশ্লেষনে তৈরী হয় ফিকহ। ফিকহর মূল উৎস চারটি: কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস।

মুসলিমঃ মুসলিম অর্থ আত্মসমর্পন কারী। যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পন করে ইসলাম গ্রহন করল তাকে মুসলিম বলা হয়। মুসলিম তিন প্রকার। যথাঃ মুঅমিন, মুনাফিক ও ফাসিক।

মুঅমিনঃ যে ব্যক্তি সকল প্রকার তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করে ইসলামের সকল বিষয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখল, মুখে স্বীকৃতি দিল এবং বাস্তব জীবনে মেনে চলল সে মুঅমিন।

মুনাফিকঃ যে মুসলিম তাগুতকে বর্জন করেনি, বা ইসলামের কোন বিষয়ে সংশয় বা সন্দেহ পোষন করে সে মুনাফিক।

তাগুতঃ তাগুত অর্থ অবাধ্য, নাফরমান। আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য ব্যক্তি ও ব্যক্তি সমষ্টিকে তাগুত্ব বলে। তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করা ঈমানের পুর্ব শর্ত। তাগুতকে বর্জন না করলে ইমান কবুল হয় না।

ফাসিকঃ যে মুসলিম ঈমান ঠিক রাখা সত্বেও ইসলামী বিধান পালনে অবহেলা বা শৈথিল্য করে সে ফাসিক।

কাফিরঃ যে ব্যক্তি ইসলামের কোন বিধাকে আংশিক বা পরিপূর্ন ভাবে অমান্য করে সে কাফির।

মুশরিকঃ যে ব্যক্তি অন্যকে আল্লাহর সমান, সমকক্ষ বা শরীক বানায় সে মুশরিক।

নাস্তিক ও নাস্তিক্যবাদঃ সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করে প্রকৃতিকে সবকিছুর স্রষ্টা মনে করা নাস্তিক্যবাদ। আর যারা নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাস করে তাদের নাস্তিক বলা হয়।

আমাল ও ইবাদাতঃ আমাল অর্থ কাজ আর ইবাদাত অর্থ দাসত্ব করা। কাজ ২প্রকারঃ ভালকাজ ও মন্দকাজ।

ভালকাজঃ শারীয়া'হ অনুমোদিত সকল কাজই ভাল কাজ। ভাল কাজকে আমলে সালিহ, নেক কাজ, সৎকাজ, নেকীর কাজ ইত্যাদি বলা হয়।

মন্দকাজঃ= শারীয়া'হ পরিপন্থী সকল কাজই মন্দকাজ। মন্দকাজকে পাপ, গুনাহ, বদী ইত্যাদি বলা হয়। গুনাহ দুই প্রকার। ছোট গুনাহ ও বড় গুনাহ তথা ছাগীরাহ ও কাবীরাহ।

ছাগীরাহঃ ছোট ছোট গুনাহকে ছাগীরাহ বলে। অযু, নামায, রোজা, হাজ্জ, উমরাহ, সাদাকাহ ইত্যাদি নেক আমল দ্বারা ছাগীরাহ মাফ হয়ে যায়।

কাবীরাহঃ বড় বড় গুনাহকে কাবীরাহ বলে। তাওবাহ ও ইস্তিগফার ব্যতীত কাবীরাহ মাফ হয় না।

তাওবাহঃ= তাওবাহ অর্থ ফিরে আসা। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে পাপ থেকে ফিরে আসাকে তাওবাহ বলে।

ইস্তিগফারঃ ইস্তিগফার অর্থ ক্ষমা চাওয়া। পাপ স্বীকার করে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাওয়াকে ইস্তিগফার বলে।

ইবাদাতঃ= ইবাদাত অর্থ বশ্যতা, হীনতা, আনুগত্য, দাসত্ব ইত্যাদি। নিজেকে হীন ও নিচ মনে করে রাসূল সাঃর বাতানো নিয়ম মেনে আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব করাকে ইবাদাত বলে।

সালাহ বা নামাযঃ ইসলামী শব্দ সালাহ এর ফার্সি প্রতি শব্দ নামায অর্থ প্রার্থনা করা, এবাদত করা। রাসূলের বাতানো নিয়মে দৈনিক পাঁচবার আল্লাহর এবাদত করাকে সালাহ বলা হয়। সালাহ এর পাঁচটি স্তর রয়েছে। যথাঃ

ফরজঃ আরবি শব্দ ফারদ্ব (উর্দু ফরজ) অর্থ নির্ধারিত। বান্দার জন্য আল্লাহর নির্ধারিত করনীয়কে ফরজ বলা হয়। ফরজ আদায় করা অবশ্যক, ছেড়ে দেয়া পাপ, অমান্য করা কুফর। ফরজ নামায হল: ফজরে ২, জোহরে ৪, আসরে ৪, মাগরিবে ৩ ও ঈশায় ৪ রাকায়াত। যারা জুময়া'হ পড়বে তারা জোহরের ৪ রাকায়াতের বদলে জুময়া'হর ২ রাকায়াত আদায় করবে।

ওয়াজিবঃ ওয়াজিব অর্থ জরুরী। রাসূল সাঃ নিয়মিত আদায় করেছেন এমন নামাযকে ওয়াজিব বলে। ইশার পর বিতর ৩রাকায়াত ও দুই ঈদে দুই রাকায়াত করে নামায হচ্ছে ওয়াজিব। ওয়াজিব আসলে গুরুত্বপূর্ন সুন্নত। হানাফী মাযহাব ছাড়া অন্য মাযহাবে ওয়াজিব বলে আলাদা কিছু নেই।

সুন্নত নামাযঃ সুন্নাত অর্থ আদর্শ। রাসূল সাঃ প্রায়ই পড়তেন এবং ফজিলত বর্ননা করেছেন এমন নামাযকে সুন্নাত বলা হয়। সুন্নাত মোট ১২ রাকায়াত। ফজরে ২, জোহরে (৪+২) ৬ , মারিবে ২ ও ইশায় ২ রাকায়াত।

মুস্তাহাবঃ মুস্তাহাব অর্থ পছন্দনীয়। রাসূল সাঃ মাঝে মাঝে করতেন এমন ইবাদাতকে মুস্তাহাব বলা হয়।

নফলঃ নফর অর্থ অতিরিক্ত। আসলে ফরজ বাদে বাকি সবই নফল। সুন্নত, মুস্তাবাহ ও নফলের অন্তর্গত। নিম্নে কয়েকটি বিশেষ নামাযের নাম ও পরিচিতি দেয়া হল:

তাহাজ্জুদ নামাযঃ শেষ রাতের নামাযকে তাহাজ্জুদ বলে।

ইশরাক্ব নামাযঃ সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্যের উত্তাপ বেড়ে যাওয়া পর্যন্ত এ নামায পড়া হয়।

দ্বোহা (চাশত) **নামাযঃ** বেলা এক প্রহরের পর এ নামায পড়া হয়।

আওয়্যাবীন নামাযঃ মাগরীবের পর ৬ রাকায়া'ত নামায পড়াকে আওয়্যাবীন বলা হয়।

তাহিয়্যাতু-ল-অযুঃ অযুর পর অযূর পানি শুকিয়ে যাবার আগে ২রাকায়া'ত নামাযকে তাহিয়্যাতু-ল-অযু বলে।

তাহিয়্যাতু-ল-মাসজিদঃ মাসজিদে প্রবেশ করে ২ রাকায়া'ত নামায পড়াকে তাহিয়্যাতু-ল-মাসজিদ বলে।

খাউফ বা ভীতির নামাযঃ যুদ্ধ ক্ষেত্রে বা অন্য কোন ভীতিকর অবস্থায় নামায পড়াকে ভীতির নামায বলে।

ক্বসর বা সফরের নামাযঃ ৪৮ মাইল বা এর চেয়ে দীর্ঘ সফরের উদ্দেশ্যে এলাকা থেকে বের হলে ৪ রাকায়াত ফরজের স্থলে ২ রাকায়াত পড়তে হয়। ইহাকে ক্বসর বা সফরের নামায বলে।

কুসুফ নামাযঃ সূর্য গ্রহনের সময়ে আদায় করা বিশেষ নামাযকে কুসুফ বলে।

খুসুফ নামাযঃ চন্দ্র গ্রহনের কালে আদায় করা বিশেষ নামাযকে খুসুফ বলে।

ইস্তিখারা নামাযঃ কোন বিশেষ ব্যাপারে কল্যান কামনা করে আদায় করা বিশেষ নামাযকে ইস্তিখারা বলে।

হাজাহ (প্রয়োজনের) **নামাযঃ** বিশেষ প্রয়োজনে আল্লাহর সাহায্য চেয়ে পড়া নামাযকে সালাতু-ল-হাজাহ বলে।

তাওবাহ নামাযঃ কোন গুনাহ হয়ে গেলে ক্ষমা চেয়ে পড়া বিশেষ নামাযকে তাওবাহ নামায বলে।

ইস্তিস্কার নামাযঃ বৃষ্টি চেয়ে আদায় করা বিশেষ নামাযকে ইস্তিস্কার নামায বলে।

সালাতু-ত-তাসবীহঃ চার রাকায়াত নামাযে ৩০০ তাসবীহ সহ বিশেষ নামাযকে সালাতু-ত-তাসবীহ বলে।

সাওম (রোজা)**ঃ** আরবি শব্দ সাওম (ফার্সি রোজা) অর্থ সংযম করা, বিরত থাকা। সুবহ সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার ও যৌন ক্রিয়া থেকে বিরত থাকাকে রোজা বলে।

সুন্নত রোজাঃ রাসূল সাঃ প্রায়ই রাখতেন এবং ফজিলত বর্ননা করেছেন এমন রোজাকে সুন্নাত রোজা বলা হয়।

যেমন: আশুরার রোজা, আরাফার দিনে রোজা, শাওয়্যালের ৬ রোজা, প্রতিমাসে ৩ রোজা ইত্যাদি।

সাহরীঃ সাহরী অর্থ রাতের শেষ প্রহর। রোজার নিয়্যতে গভীর রাতের খানাকে সাহরী বলে। ফজরের আগ পর্যন্ত সাহরী খাওয়া যায়।

ইফতারঃ ইফতার অর্থ ভঙ্গ করা। সারাদিন রোজা রাখার পর সন্ধায় কিছু খেয়ে রোজা ভঙ্গ করাকে ইফতার বলে। সূর্য ডুবার সাথে সাথে ইফতার করতে হয়। ইফতারে দেরি করা নিন্দনীয়।

তারাবীহঃ রামাদ্বানে রাতে নফল নামাজ পড়ার ফজিলত বর্ননা করেছেন রাসূল সাঃ। এই নামাযকে কিয়ামুল্লাইল বলা হয়। বর্তমান সমাজে ইহাই তারাবীহ নামে খ্যাত।

ঈদঃ ঈদ অর্থ উৎসব, আনন্দ, উল্লাস। বছরে দুইটি ঈদ হয়। ঈদ আল-ফিতর ও ঈদ আল-আদ্বহা। ঈদে নানা ভাবে আনন্দ করা শারীয়া'হ অনুমোদিত।

ঈদ আল-ফিতরঃ ফিতর অর্থ ভঙ্গ করা। রোজা ভঙ্গের পর যে উৎসব করা হয় ইহাকে ঈদ আল-ফিতর বলে।

ঈদ আল-আদ্বহাঃ আদ্বহা অর্থ কুরবানী করা। কুরবানীর উৎসবকে ঈদ আল-আদ্বহা বলা হয়।

শবে বরাতঃ ১৫ই শা'বানের রাতকে শবে বরাত বলা হয়। শবে বরাতে মসজিদে লোক সমাগম করে অনুষ্ঠান করা সুন্নতের পরিপন্থি কাজ।

শবে কদরঃ শবে কদর হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। রমজানের ২১, ২৩, ২৫,২৭, ২৯ এ পাঁচ রাতের যে কোনটি শবে কদর হতে পারে। শবে কদরকে লাইলাতু-ল-কাদার, কদরের রজনী, ভাগ্য রজনী ইত্যাদি বলা হয়।

আশূরাঃ মুহাররাম মাসের ১০তারিখকে আশূরা বলে। আশূরার দিন রোজা রাখা সুন্নাত।

শবে মিরাজঃ রাজাব মাসের ২৭তারিখের রাতে রাসূল সাঃ মিরাজ গিয়েছিলেন। তাই এরাতকে শবে মিরাজ বা মিরাজ রজনী বলা হয়। মিরাজ রজনীতে বা মিরাজের দিনে কোন বিশেষ ইবাদাত করা সুন্নত নয়।

মিরাজঃ মিরাজ অর্থ উর্দ্ধগমন। রাসূল সাঃ এক রাতে ফিরিস্তা জিবরাঈল আঃর সাথে সপ্ত আকাশ ও সিদরাতু-ল-মুনতাহা পেরিয়ে আরশ মুয়া'ল্লা পর্যন্ত ভ্রমন করেছিলেন। এই ভ্রমনকে মিরাজ বলা হয়।

হাজ্জঃ হাজ্জ অর্থ ইচ্ছা করা। ইবাদাতের উদ্দেশ্যে মক্কাহ গিয়ে বাইতুল্লাহকে কেন্দ্র করে নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত কাজ আদায় করাকে হাজ্জ বলে। হাজ্জ যিল-হাজ্জ মাসের ৮তারিখ থেকে শুরু হয়।

যাকাতঃ যাকাত অর্থ পরিচ্ছন্ন করা। যাকাত দিলে মাল পরিচ্ছন্ন হয়। ধনী ব্যক্তি প্রতি বছর তার নগদ অর্থ, সোনা-রোপা ও ব্যবসা সামগ্রীর ২.৫% আল্লাহর রাস্তায় দান করবে। ইহাকে যাকাত বলে।

হিসাব করে যাকাত আদায় করা সরকারের দায়িত্ব। যাকাতের অর্থ নির্ধারিত ৮টি খাতে ব্যয় করতে হয়।

যাকাত দিলে সম্পদ পবিত্র হয়। আর যাকাত না দিলে সম্পদ হারাম হয়ে যায়। পরকালে এসম্পদকে উত্তপ্ত করে মালিকের গায়ে চেঁকা দেয়া হবে।

সাদাক্বাহঃ ছোয়াবের আশায় কাউকে কিছু দান করাকে সাদাকাহ বলে। সাদাকাহ দিলে মালে বরকত হয়।

লিল্লাহঃ আল্লাহর জন্য কিছু করা বা দেয়াকে লিল্লাহ বলে। লিল্লাহ অতি প্রশংসনীয় ও উৎকৃষ্ট।

অযুঃ (পবিত্রতার উদ্দেশ্যে) নির্ধারিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত ও মাসেহ করাকে অযু বলে।

গোসলঃ গোসল অর্থ ধৌত করা। পবিত্রতা হাসিলের জন্য (নাক, মুখ সহ) পুরা শরীর ধৌত করাকে গোসল বলে।

তায়াম্মুমঃ তায়াম্মুম অর্থ ইচ্ছা করা। পবিত্রতার উদ্দেশ্যে মাটি দিয়ে হাত মুখ মাসেহ করাকে তায়াম্মুম বলে। পানি না পাওয়া গেলে বা পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে অযু ও গোসলের বদলে তায়াম্মুম করতে হয়।

মাদরাসাহঃ মাদরাসাহ অর্থ শিক্ষা কেন্দ্র। ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রকে মাদরাসাহ বলে। মাদরাসাহ ৫ প্রকার।

রাওদ্বাতু-ল-আত্বফালঃ অর্থ শিশু কানন। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রকে রাওদ্বাতু-ল-আত্বফাল (কিন্ডার গার্ডেন) বলে।

মাদরাসাহ ইবতিদাইয়্যাহঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়কে মাদরাসাহ ইবতিদাইয়্যাহ (প্রাইমারি স্কুল) বলে।

মাদরাসাহ ছানাবিয়্যাহঃ উচ্ছ বিদ্যালয়কে মাদরাসাহ ছানাবিয়্যাহ (হাই স্কুল) বলে।

কুল্লিয়্যাহঃ মহা-বিদ্যালয়কে কুল্লিয়্যাহ বলা হয়। ইংরেজীতে বলে কলেজ।

জামিয়া'হঃ বিশ্ব বিদ্যালয়কে জামিয়া'হ বলা হয়। ইংরেজীতে বলে ইউনিভার্সিটি।

মাসজিদঃ আল্লাহর ইবাদাতের জন্য নির্ধারিত স্থানকে মাসজিদ বলা হয়। মাসজিদ দুই প্রকার। ওয়াক্তিয়্যাহ মাসজিদ ও জামি' মাসজিদ।

ওয়াক্তিয়্যাহ মাসজিদঃ যে মাসজিদে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায হয়। তাকে ওয়াক্তিয়্যাহ মাসজিদ বলে।

জামি' মাসজিদঃ যে মাসজিদে জুমুয়া'হর নামায আদায় করা হয় তাকে জামি' মাসজিদ বলে।

ইমাম ও ইমামাতঃ ইমাম অর্থ নেতা। ইমামাত অর্থ নেতৃত্ব। ইসলামী পরিভাষায় নামাযে নেতৃত্ব দেয়াকে ছোট ইমামাত (ইমামাত সুগরা) আর সমাজে নেতৃত্ব দেয়াকে বড় ইমামাত (ইমামাত কুবরা) বলা হয়।

আযান ও মুয়াযযিনঃ আযান অর্থ ঘোষনা আর মুয়াযযিন অর্থ ঘোষনাকারী। যেব্যক্তি নামাযের সময়ে আল্লাহর মহত্বের ও বড়ত্বের কথা ঘোষনা করে এবং লোকজনকে নামাযের জন্য আহ্বান করে তাকে মুয়াযযিন বলা হয়।

আলিম উলামাঃ আলিম অর্থ জ্ঞানী। ইসলামী বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিকে আলিম বলে। আলিম এর বহুবচন উলামা।

জামায়াতঃ জামায়াত অর্থ দল। দলবদ্ধ ভাবে নামায আদায় করাকে নামাযের জামায়াত বলে।

জুমুয়া'হঃ জুমুয়া'হ অর্থ একত্রিত হওয়া। জুমাবারে মসজিদে একত্রিত হয়ে সবাই মিলে জুমুয়া'হর নামায আদায় করা হয়। জুমুয়া'হর নামাযের আগে খুতবাহ বলা হয়।

খুতবাহঃ খুতবাহ অর্থ বক্তৃতা করা, ভাষন দেয়া। জুমুয়া'হর নামাযের আগে ও ঈদের নামাযের পরে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ইমাম সাহেবের ভাষনকে খুতবাহ বলে।

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহঃ দ্বীন কায়েম, দ্বীনের হেফাজত ও জাতির কল্যানে সর্বাত্বক প্রচেষ্ঠাকে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বলে। জিহাদের চূড়ান্ত পর্যায় হল যুদ্ধ।

শহীদঃ কাফিরের হাতে নিহত ব্যক্তিকে শহীদ বলা হয়। শহীদ বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে এবং বিশেষ মর্যাদায় ভুষিত হবে।
ফিরিস্তাঃ ফিরিস্তা নূরের তৈরী। তারা সম্পূর্ন অনুগত জাতি। আল্লাহ যা হুকুম করেন ফিরিস্তা তাই করে। চারজন ফিরিস্তা অতি প্রসিদ্ধ ও বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত। তারা হলেন।

জিবরাঈল আঃ। ফিরস্তাদের নেতা। আল্লাহর বিশেষ দূত। আল্লাহর বাণী নবী-রাসুলগণের নিকট পৌছে দেয়া ও তাদের সাহায্য করা তাঁর কাজ। তাঁর অপর নাম রূহু-ল্-আমীন, রূহু-ল্-কুদ্স্, রূহ ইত্যাদি।

মিকাঈল আঃ। তিনি জল-বায়ূ তথা আব-হাওয়া, ফল-ফসল ও খাদ্য-শষ্যের দায়িত্বে নিয়োজিত।

ইসরাফীল আঃ। মহা-প্রলয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত ফিরিস্তা। আল্লাহ হুকুম করলে তিনি সিঙ্গা ফুঁকবেন। কেঁপে উঠবে মহা-বিশ্ব। প্রকম্পিত হবে তামাম জাহান। আকাশ ভেঙ্গে পড়বে। পাহাড়-পর্বত ধুলি কনার মত উড়ে যাবে। সূর্য্যের আলো নিভে যাবে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র সব ভেঙ্গে পড়বে। হয়ে যাবে মহা-প্রলয়, কিয়ামত।

আজরাঈল আঃ। প্রাণী-কূলের জান কবজের দায়িত্ব প্রাপ্ত ফিরিস্তা। অপর নাম মালাকু-ল্-মাউত, মৃত্যু-দূত।

রিদ্ওয়ানঃ জান্নাতের দায়িত্ব প্রাপ্ত ফিরিস্তার নাম রিদ্ওয়ান।

মালিকঃ জাহান্নামের দায়িত্ব প্রাপ্ত ফিরিস্তার নাম মালিক।

কিরামান কাতিবীনঃ মানুষের কাজ-কর্মের হিসাব রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিস্তাগণকে বলা হয় কিরামান কাতিবীন, সম্মানিত লেখনগণ।

সায়্যাহীনঃ একদল ফিরিস্তা সব সময় পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়। কেহ নেক-কাজ করলে তারা খুশি হয়। তাদের জন্য ইস্তিগফার করে। তাদের বলা হয় সায়্যাহীন, ভ্রমন কারী দল।

মুন্কার নাকীরঃ মানুষ মারা যাবার পর কবরে এসে প্রশ্ন কারী ফিরিস্তা হলেন মুন্কার নাকীর।

হামালাতু-ল্-আ'রশঃ আরশ রহনকারী ফিরিস্তাগণকে হামালাতু-ল্-আ'রশ বলা হয় তারা আটজন।

জিন্নঃ জিন্ন আগুনের তৈরী। জিন্ন শয়তানের জাতি। তবে অনেক জিন্ন ইসলাম গ্রহন করে ভাল হয়ে যায়। তারা শারীয়াহ মোতাবেক জীবন যাপন করে। জীন্নকে দৈত্য, দানব, ভুত, পেতনী, পরি ইত্যাদিও বলা হয়।
কিয়ামতের দিন জিন্নদেরকেও হিসাব হবে। মুঅমিন জিন্নরা জান্নাতে আর পাপিষ্ঠ জিন্নরা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

শয়তানঃ শয়তান অর্থ অশুভ, দুষ্ট। যে সকল মানুষ ও জিন্ন দুষ্ট পথে চলে তাদের শয়তান বলা হয়। শয়তানদের নেতার নাম ইবলিস।

নবীঃ দ্বীনের প্রচার, প্রসার ও দ্বীনের ধারক হিসাবে আল্লাহর মণোনীত ব্যক্তিবর্গকে নবী বলা হয়।

রাসূলঃ রাসূল অর্থ বার্তা বাহক, দূত। আল্লাহর দূত হিসাবে দুনিয়ায় প্রেরিত মহান ব্যক্তিবর্গকে রাসূল বলা হয়। রাসূলগণকে নতুন শারীয়াহ (বিধান) দেয়া হয় আর নবীগণ সমসাময়িক রাসূলের বিধান মেনে চলেন।

হিজরতঃ হিজরত অর্থ দেশ ত্যাগ। রাসূল ও সাহাবাহগণ ইসলামের জন্য নিজেদের দেশ ছেড়ে মদীনাহ গিয়ে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। ইহাকে হিজরত বলা হয়।

সাহাবাহঃ সাহাবাহ অর্থ সঙ্গী-সাথী। রাসূল সাঃর সঙ্গী আনসার ও মুহাজিরগণকে সাহাবাহ বলা হয়।

মুহাজিরঃ মুহাজির অর্থ হিজরত কারী। যে সকল সাহাবা হিজরত করে মদীনাহ চলে এসেছিলেন তাদের মুহাজির বলা হয়।

আনসারঃ আনসার অর্থ সাহায্যকারী। মদীনাহর সাহাবাহগণ আগত মুসলমানদের সাহায্য করে ছিলেন। তাই তাদের আনসার বলা হয়।

আশারা মুবাশশারাহঃ আশারা অর্থ দশ। আর মিবাশশারাহ অর্থ সু-সংবাদ প্রাপ্ত। যে দশজন সাহাবাহ জীবিত অবস্থায় জান্নাতের নিশ্চয়তা পেয়েছেন তাদের আশারা মুবাশশারাহ বলা হয়। তারা হলেন:

আবু-বকর রাঃ। (রাসূল সাঃর বাল্যবন্ধু ও শশুর। আইশাহ রাঃর বাবা। ইসলামের ১ম খালীফাহ।)
উমার রাঃ। (রাসূল সাঃর শশুর, হাফসাহ রাঃর বাবা। ইসলামের ২য় খালীফাহ।)
উছমান রাঃ। (রাসূল সাঃর জামাতা, রুকাইয়্যাহ ও উম্মু-কুলছুম রাঃর স্বামী। ইসলামের ৩য় খালীফাহ।)
আলী রাঃ। (রাসূল সাঃর চাচাত ভাই ও জামাতা। ফাতিমাহ রাঃর স্বামী। ইসলামের ৪র্থ খালীফাহ।)
তালহাহ বিন উবাইদুলাহ রাঃ।
যুবাইর বিন আয়্যাম রাঃ।
আব্দুর রাহমান বিন আউফ রাঃ।
সায়াদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাঃ।
সাঈদ বিন যাইদ রাঃ।
আবু-উবাইদাহ বিন জাররাহ রাঃ।

তাবিয়ীঃ তাবিয়ী অর্থ অনুসারী। সাহাবাদের অনুসারীগণকে তাবিয়ী বলা হয়।

খিলাফাহঃ খিলাফাহ অর্থ প্রনিধিত্ব। ইসলামী বিধাম মতে সরকার বা প্রশাসন পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব

করে, তাই ইসলামী সরকার ব্যবস্থাকে খিলাফাহ বলা হয়।

খালীফাহঃ খালীফাহ অর্থ প্রতিনিধি। ইসলামী বিধাম মতে সরকার প্রধান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে, তাই তাকে খালীফাহ বলা হয়।

খিলাফাহ রাশিদাহঃ রাসূল সাঃর আদর্শে সঠিক পথে পরিচালিত খিলাফাহকে খিলাফাহ রাশিদাহ বলে। আবু-বকর, উমার, উছমান ও আলী রাঃহুম। এ চার জনের খিলাফাত কালকে খিলাফাহ রাশিদাহ বলা হয়। খিলাফাহ রাশিদাহ ছিল নবী সাঃর আদর্শে পরিচালিত সঠিক খিলাফাহ। তার পর আসে গোত্রীয় শাসন।

উমাইয়্যাহ খিলাফাহঃ ইসলামের ইতিহাসে উমাইয়্যাহ গুত্রের খিলাফাত কালকে উমাইয়্যাহ খিলাফাহ বলে।

আব্বাসীয় খিলাফাহঃ ইসলামের ইতিহাসে আব্বাসীয়া গুত্রের খিলাফাত কালকে আব্বাসীয় খিলাফাহ বলে।

ফাতিমী খিলাফাহঃ ইসলামের ইতিহাসে ফাতিমী গুত্রের খিলাফাত কালকে ফাতিমী খিলাফাহ বলে।

উছমানী খিলাফাহঃ ইসলামের ইতিহাসে তার্কীদের খিলাফাত কালকে উছমানী খিলাফাহ বলে।

কিতাবঃ রাসূলকে দেয়া গ্রন্থকে কিতাব বলা হয়। আল্লাহ চারজন রাসূলকে চারটি কিতাব দিয়েছেন। যথাঃ তাওরাত মূসা আঃকে, যাবুর দাউদ আঃকে, ইন্জিল ঈসা আঃকে আর আল-কুরআন মুহাম্মাদ সাঃকে।

এর মধ্যে তাওরাত, ইন্জিল ও আল-কুরআন পূর্নাঙ্গ কিতাব। এসব কিতাবে আল্লাহর বিধান সহ সকল বিষয় আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ এতিনটি কিতাব শুধু ধর্মগ্রন্থই নয়। আল্লাহর মনোনীত সংবিধান ও। আর যাবুরে ছিল শুধু উপদেশ আর নীতি কথা। অর্থাৎ যাবূর শুধুই ধর্মগ্রন্থ।

সাহিফাহঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রাসূলগণকে দেয়া ছোট ছোট পুস্তিকাকে সাহিফাহ বলা হয়।

কুরআনঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ সাঃকে দেয়া কিতাব হল কুরআন। কুরআন অর্থ পঠিত। জিবরাঈল আঃ কিতাবটি পাঠ করে শুনিয়েছেন বিধায় একে কুরআন বলা হয়। তাওরাত দেয়া হয়েছিল লিখিত ভাবে আর ইন্জিল ঈসা আঃর অন্তরে।

তাফসীর ও মুফাসসীরঃ পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষনকে তাফসীর বলে। যিনি তাফসীর করেন তাকে মুফাসসীর বলা হয়।

হাদীছ ও মুহাদ্দিছঃ মুহাম্মাদ সাঃর বাণী, তাঁর কাজ ও সমর্থনকে হাদীছ বলা হয়। হাদীছ বর্ননা কারীকে রাওয়ী এবং হাদীছের বিশ্লেষনকারীকে মুহাদ্দিছ বলা হয়।

ফতোয়া ও মুফতীঃ কোন বিশেষ সমস্যায় ইসলামী আইন মত দেয়া সমাধানকে ফতোয়া বলে। আর যে বিজ্ঞ আলিম ফতোয়া দিয়ে থাকেন তাকে মুফতী বলা হয়।

ক্বাদ্বা ও ক্বাদ্বীঃ ইসলামী আলাদত থেকে দেয়া আইন সম্মত রায়কে ক্বাদ্বা বা বিচার বলে। যিনি বিচার করেন

তাকে বলা হয় ক্বাদ্বী (উর্দু উচ্ছারনে কাজী)।

বিঃ দ্রঃ= ফতোয়া ও ক্বাদ্বা আসলে একই। তবে ক্বাদ্বী সরকারী নিয়োগ প্রাপ্ত বিধায় তার রায় মানতে জনগণ বাধ্য থাকে। আর মুফতী সরকারী নিয়োগ প্রান্ত নয়। তাই মুফতীর ফতোয়া মানতে জনগণ সরকারী ভাবে বাধ্য নয়। তবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে আবশ্যক।

সুন্নাহঃ সুন্নাহ অর্থ আদর্শ, তরিকা। শারীয়াতের পরিভাষায় মুহাম্মাদ সাঃর আদর্শকে সুন্নাহ বলা হয়।
আর ফিকহর পরিভাষায় যেসব নফল ইবাদাত রাসূল সাঃ নিজে করেছেন তাকে সুন্নাত বলা হয়।

সিরাতঃ সিরাত অর্থ পথ। রাসূল সাঃ জীবন পথকে তথা জীবনে তিনি যা যা করেছেন এসবকে সিরাত বলে।

ব্যবসাঃ মালকে মালের বিনিময়ে বদল করাকে ব্যবসা বলে। শারীয়াহ মতে মাল নয় (যেমন মাদক দ্রব্য, ইলম ইত্যাদি) এমন বস্তুর লেনদেন ব্যবসা নয়।

বিবাহঃ প্রস্তাব ও গ্রহনের মাধ্যমে বিবাহ সংঘঠিত হয়। বর বা কনের পক্ষে ওয়ালী (অবিভাবক) বা ওয়াকীল (প্রতিনিধি)র দ্বারাও বিবাহ সংগঠিত হয়ে যায়। বিবাহে কম পক্ষে দুইজন সাক্ষি থাকা আবশ্যক।

ওয়ালিমাহঃ নব-বধুকে স্বাগত জানিয়ে উৎসব করাকে ওয়ালিমাহ বলে। বাসরের পরদিন ওয়ালিমাহ করা সুন্নত।

তালাকঃ বিবাহ ভেঙ্গে দেয়ার বৈধ পন্থা তালাক। তালাক শুধু স্বামী দিতে পারে। স্ত্রী ইচ্ছা করলে স্বামীর কাছে তালাক চাবে বা আদালতের আশ্রয় নেবে। ইসলামী বিধান মতে আদালত বিবাহ ভেঙ্গে দেয়ার ক্ষমতা রাখে।

হারামঃ হারাম অর্থ অবৈধ। শারীয়াহ আইনে অবৈধ এমন প্রতিটি কাজ, কথা ও পদক্ষেপকে হারাম বলা হয়। হারাম দুই প্রকার।

মানসুস হারামঃ যেসব হারামের কথা কুরআনে বা হাদীছে উল্লেখ হয়েছে ইহাকে মানসুস হারাম বলে। মানসুস হারামকে হালাল মনে করা কুফর।

মুজতাহাদ হারামঃ ফিকহের নিয়মে পড়ে ধার্য করা হারামকে মুজতাহাদ হারাম বলে। যেমন: কচ্ছপ খাওয়া, কাকড়া খাওয়া ইত্যাদি। মুজতাহাদ হারামকে হালাল মনে করলে পাপ হয় না। হানাফী মাযহাবে এসব হারাম হলেও অন্য মাযহাবে হালাল।

মাকরুহঃ যা হারাম নয়। তবে না করা উত্তম ইহাকে মাকরুহ বলে।

মুবাহঃ যা স্পষ্টত বৈধ না হলেও হারাম নয় ইহাকে মুবাহ বলা হয়।

শিশুঃ নাবালিগ ছেলেমেয়েদের শিশু বলা হয়। ছেলেরা স্বপ্নদোষ ও মেয়েরা মাসিক স্রাবের মাধ্যমে বালিগ হয়। সাধারনত ছেলেরা ১২-১৫ এবং মেয়েরা ৯-১৩ বছর বয়সের মধ্যেই বালিগ হয়ে যায়। একটি ছেলে বা মেয়ে যেদিন বালিগ হল সেদিন থেকে সে আর শিশু থাকে না। সেদিন থেকেই সে তার পাপ-পূন্যের ভাগী হয়। মুনকার নাকীর ফিরিস্তা তার সঙ্গী হয়ে যায় এবং তার হিসাব রাখা শুরু হয়।

আক্বীক্বাহঃ নব জাতক শিশুর জন্য উৎসব করাকে আক্বীক্বাহ বলে। আক্বীক্বাহ শিশুর সপ্তম দিনে করা মুস্তাহাব। সাধ্য থাকলে আক্বীক্বাহর জন্য কমপক্ষে একটা ছাগল বা ভেড়া জবাই করতে হয়।

পুরুষ ও মহিলাঃ ইসলামী শারীয়াহ মতে স্বাবালিগ হয়ে যাওয়া ছেলেদের পুরুষ আর মেয়েদের মহিলা বলা হয়। (আর পাশ্চাত্যের সংজ্ঞা মতে ১৮ উর্দ্ধে ছেলেদের পুরুষ মেয়েদের মহিলা বলা হয়।)

কুফরঃ কুফর অর্থ অমান্য করা। রাসূল সাঃর আনিত শারীয়া'হর কোন কিছু অমান্য করাকে কুফর বলা হয়।

শিরকঃ অর্থ শরীক বা অংশিদাব বানানো। কোন কিছুতে আল্লাহর শরীক বা অংশিদার বানানোকে শিরক বলে।

বিদয়াতঃ বিদয়াত অর্থ উদ্ভাবন করা। (রাসূল সাঃ ও সাহাবদের পর) ইবাদাত হিসাবে উদ্ভাবিত সকল কাজই বিদয়া'ত। যেমন: মিলাদ, কুল খানি, চেহলাম ইত্যাদি।

রাসূল সাঃ বলেছেন: উদ্ভাবিত সকল কিছু থেকে দূরে থাক। কারন উদ্ভাবিত প্রতিটি কাজই বিদয়া'ত। প্রতিটি বিদয়া'তই বিভ্রান্তি আর প্রতিটি বিভ্রান্তিই জাহন্নামে।

সুদঃ যে কোন মালকে একই জাতের মাল দিয়ে কম-বেশ করে হাত বদলকে সূদ বলা হয়। সূদ জঘন্যতম মহা-পাপ। সূদ দাতা, গ্রহিতা, সূদের সাক্ষ্যি ও লেখক সবাইকে লা#নত করা হয়েছে।

ঘুষঃ কাউকে কিছু দিয়ে অবৈধ ভাবে কার্য হাসিল করাকে ঘুষ বলে। বাঙ্গালী সমাজে ঘুষকে বখশিস বলা হয়।

মদঃ নিশা জাতীয় পানীয়কে মদ বলে। যে বস্তু অধিক খেলে নিশা হয় এর সামান্য ও হারাম।

জোয়াঃ যে কোন খেলায় হার জিতের সাথে অর্থ বা সম্পদের দাও ধরাকে জোয়া বলে।

লটারীঃ লটারী ও এক প্রকার জোয়া। তবে সম্পদের দাও ব্যতীত শুধু বাছাই করার জন্য লটারী করা যায়।

চুরিঃ সংরক্ষিত মালকে মালিকের অগোচরে নিয়ে যাওয়া বা লুকিয়ে রাখাকে চুরি বলে। চুরি কাবীরাহ গুনাহ। চুরির সাজা কুরআনে নির্ধারন করে দেয়া হয়েছে।

কবর যিয়ারতঃ যিয়ারত অর্থ দেখা সাক্ষাৎ। কবর দেখতে যাওয়াকে কবর যিয়ারত বলা হয়।

ইসলামের সূচনাতে কবরে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। পরে অনুমতি দেয়া হয়। কবর যিয়ারতের মূল উদ্দেশ্য আখেরাতের স্মরন। তাই কবরে একা যেতে হয়। দল বেঁধে কবরে যাওয়া উচিত নয়।

কবর ইবাদাতের জাগা নয়। তবে কবরবাসীকে সালাম করা যায়। রাসূল সাঃ কবরে গিয়ে বলতেন: কবরবাসীগণ! তোমাদের প্রতি সালাম। আল্লাহ সবাইকে ক্ষমা করুক। তোমরা আগে চলে গেছ, আমরা পরে আসছি।

কবরের ৩টি প্রশ্নঃ কবরে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তিনটি প্রশ্ন করা হবে। তা হলঃ-
ক. তোমার রাব্ব কে? *(মানে বাস্তব জীবনে তুমি কার বাতানো নীতিমালা বা দর্শন মেনে চলেছ?)*

খ. তোমার দ্বীন কি? *(মানে বাস্তব জীবনে তোমার অনুসরনীয় আদর্শ, দর্শন, নীতিমালা বা বিধানের নাম কি?)*
গ. তোমাদের অনুকরণীয় হিসাবে পাঠানো ব্যক্তি কে? *(মানে কাকে অনুকরণ করে জীবন যাপন করেছ ?)*

করবে করা তিনটি প্রশ্নের উত্তরঃ কবরে করা তিনটি প্রশ্নের উত্তর হল:
ক. আমার রাব্ব আল্লাহ।
খ. আমার দ্বীন ইসলাম।
গ. আমাদের অনুকরণীয় হিসাবে যাকে পাঠানো হয়েছে তিনি হলেন মুহাম্মাদ সাঃ।

বিঃ দ্রঃ= কবরে মিথ্যা বলার ক্ষমতা থাকবে না। যা বাস্তব, যা সত্য মানুষ তাই বলবে। কবরের প্রশ্ন উত্তরে বাস্তব জীবনের প্রতিফলন ঘটবে। সেখানে মিথ্যা বলা যাবে না।

মহা-শূন্যঃ পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত শূন্য স্থানকে মহা-শূন্য বলে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি মহা-শূন্যে অবস্থিত।

আসমানঃ মহা-শূন্যের উপরে শক্ত আবরনের বেষ্টনীকে আসমান বলে। আসমান ফিরিস্তাদের আবাস। আসমান মোট সাতটি।

সিদরাতু-ল-মুনতাহাঃ সিদরাতু-ল-মুনতাহা অর্থ সীমান্তবর্তি বরইগাছ। সপ্ত আকাশের উপর ফিরিস্তাদের জন্য একটি সীমানা ঠিক করা আছে। এ সীমানার নীচের ফিরিস্তা উপরে যেতে পারে না। এখানে একটি বরই গাছ বিদ্যমান। এস্থানকে বলা হয় সিদরাতু-ল-মুনতাহা। সিদরাতু-ল-মুনতাহার নিকটে জান্নাতু-ল-মা'ওয়া অবস্থিত।

আরশ, কুরসীঃ আরশ অর্থ বাজা বসার বিশেষ আসন। আর কুরসী অর্থ চেয়ার। আল্লাহর বিশেষ আসনকে আরশ ও কুরসী বলা হয়। আল্লাহর আরশের নীচে জান্নাতু-ল-ফিরদাউস অবস্থিত।

আয়াতু-ল-কুরসীঃ পবিত্র কুরআনের ২৫৫তম আয়াতে আল্লাহর কুরসী ও ক্ষমতার কথা বর্নিত হয়েছে। তাই এআয়াতকে আয়াতু-ল-কুরসী বলা হয়।

বাইতু-ল-মা'মূরঃ আকাশে ফিরিস্তাদের জন্য একটি কিবলা রয়েছে। ফিরিস্তাগণ এঘরটিকে তাওয়াফ করেন। এর নাম বাইতু-ল-মা'মূর।

কিবলাহঃ যে ঘরের দিকে মুখ করে নামায পড়া হয় তাকে কিবলাহ বলে। বিশ্ব মানবতার কিবলাহ হচ্ছে কা'বাহ যা মক্কাহ শহরে অবস্থিত। কা'বাহকে প্রদক্ষিন করে তাওয়াফ, উমরাহ ও হাজ্জ করা হয়।
কিয়ামতঃ মহান আল্লাহ এ মহা-বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাতের জন্য। যখন এবিশ্বে আল্লাহর ইবাদাত করার মত কেউ থাকবে না। আল্লাহ তখন সব ধ্বংস করে দেবেন। ইহাই কিয়ামত।

পুনরোত্থানঃ কিয়ামতের (৪০বসর) পর পুনরোত্থান। তখন সবকিছু আবার তৈরী হবে। সবাই জীবিত হয়ে উঠবে।

হাশরঃ হাশর অর্থ মজায়েত। পুনরোত্থানের পর কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকলের মহা-জমায়েত সংঘঠিত হবে। ইহাই হাশর।

হাশরের ময়দানঃ আমাদের পৃথিবীই হাশরের ময়দান। তখন এ পৃথিবীকে ভিন্ন রূপে সাজানো হবে। সাগর পাহাড় সব সমতল করা হবে। মাটির আদ্রতা শুকিয়ে যাবে। পুড়ামাটির মত সমতল পৃথিবীই হবে হাশরের ময়দান।

মিজানঃ মিজান অর্থ মান-দন্ড, পরিমাপ যন্ত্র। হাশরের ময়দানে নেকি ও বদির পরিমাপের জন্য স্থাপিত মান-দন্ডকে মিজান বলা হয়। আরাফাতের ময়দানে ইনসাফের মিজান স্থাপন করা হবে।

হিসাবঃ হাশরের ময়দানে মহান আল্লাহ বিচারক হয়ে মানুষ ও জিন্ন জাতির বিচার করবেন। জান্নাত ও জাহান্নামের ফয়সালা করবেন। সকলের কর্মফলের রায় ঘোষনা করবেন। ইহাই হিসাব।

আমল নামাঃ বিচারের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেকের জীবনের সকল কিছুর রিপোর্ট পেশ করা হবে। ইহাই আমলনামা বা কিতাব।

পুল সিরাতঃ জান্নাত আকাশের উপর। হাশর ময়দান (দুনিয়া) থেকে জান্নাতে যাবার পথে জাহান্নাম। জাহান্নাম অতিক্রম করে জান্নাতে যাবার পথকে বলা হয় সিরাত। অনেকে বলে থাকেন পুল সিরাত।

জান্নাতঃ জান্নাত নিয়ামতে পরিপূর্ন স্থান। একজন গরীব জান্নাতীকে দশটি দুনিয়া সমান সাম্রাজ্য দেয়া হবে। বিস্তারিত জানতে ‘‘যেভাবে ঈমান আনতে হয়’’ বইয়ের আখেরাত অধ্যায় দেখে নিন।

হূর ও গিলমানঃ জান্নাতী কিশোরীদের হুর এবং কিশোরদের গিলমান বলা হয়।

আল-কাওছারঃ জান্নাতের একটি নদীর নাম। যার পানি বড়ই বরকত ময়। একবার পান করলে আর তৃষ্ণা হবে না। হাশরের ময়দানেও কূপ হিসাবে এর অস্থিত্য বিদ্যমান থাকবে।

আল-হায়াতঃ জান্নাতের একটি নদীর নাম। বরকতময় এ পানীতে গোসল করার সাথে মানুষের দেহ-মন সব বদলে যাবে। মানুষ হয়ে যাবে জান্নাতের উপযোগী, অতি সুন্দর, সতেজ ও ফুটফুটে।

সালসাবীল ও যানজাবীলঃ জান্নাতের দুটি ঝর্নার নাম। যার সুন্দর্য ও সুবাস হবে মন মাতানো।

জাহান্নামঃ জাহান্নাম আযাব ও গযবের স্থান। আগুনের দাহন, সাপের কামড়, হাতুড়ি পিঠানো সহ জাহান্নামে নানা ধরনের আযাব দেয়া হবে। বিস্তারিত জানতে ‘‘যেভাবে ঈমান আনতে হয়’’ বইয়ের আখেরাত অধ্যায় দেখে নিন।

হা’মীমঃ জাহানামের নদীর নাম। যা দিয়ে অতি দুর্গন্ধময় ফুটন্ত পুঁজ, রক্ত ও জ্বলন্ত মাংসের নির্জাস প্রবাহিত হবে। এর উত্তাপ হবে পৃথিবী সর্বোচ্ছ তাপমাত্রায় চেয়ে বহুগুন বেশী। জাহন্নামীদের হামীম পানে বাধ্য করা হবে। তাদের মাথার উপর হামীম ঢেলে দেয়া হবে।